ইউনিট- ৫

বন ও বন নার্সারি

ভূমিকা

বন বলতে সাধারণত গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত বিস্তৃত এলাকাকে বুঝানো হয়। বনে বৃহৎ বৃক্ষের সংখ্যা বেশি হলেও সে সঙ্গে ছোট–বড় আরও অনেক ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। গাছপালা ছাড়াও বনে বাস করে বিভিন্ন প্রকার জীব জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এবং এদের সমন্বয়ে একটি পৃথক বনজ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে বন একটি বিশাল সম্পদ ভান্ডারের ভূমিকা পালন করে আসছে। আদিকালে মানুষেরা বনে বসবাস করত এবং বনই ছিল তাদের আহার ও বাসস্থান। বর্তমানকালেও বন তথা গাছ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে থাকে।

বনাঞ্চল প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিমভাবে গড়ে উঠতে পারে। মানুষের সহায়তা ছাড়া প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা বনকে প্রাকৃতিক বন বলা হয়। যথা– সুন্দরবন, মধুপুরের, শালবন ইত্যাদি। অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকায় গাছ লাগিয়ে যে বন সৃষ্টি করা হয় তাকে কৃত্রিম বন বলে। চট্টগ্রামের সেগুন বন বা গামার বন হচ্ছে কৃত্রিম বনের উদাহরণ। কৃত্রিমভাবে বনাঞ্চল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে নার্সারিতে চারা উৎপাদন। নার্সারি বা বীজতলা বলতে চারা উৎপাদন কেন্দ্রকে বুঝানো হয়ে থাকে। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে– যে স্থানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চারা উৎপন্ন হয় এবং রোপণের পূর্ব পর্যন্ত চারা লালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে নার্সারি বলে। নার্সারিতে উৎপাদিত চারা পরে বাগানে রোপণ করা হয়।

পাঠ-৫.১ : বন পরিচিতি ও বনের গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বন কি তা বলতে পারবেন।
- বনের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন।
- বনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বন

এক কথায় বন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের সমাবেশ। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ তথা গাছের সমাবেশ হলেও বনে বড় বড় গাছের সংখ্যা বেশি থাকে। বনে বড় গাছের সংখ্যা বেশি হওয়ায় উপরের দিকে একটা আচ্ছাদনের সৃষ্টি হয় যা নিচে ছায়ার সৃষ্টি করে। বনের নিচে ছায়াতে বিভিন্ন জীব-জন্তু পাখি ও কীট–পতঙ্গ নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারে। কাজেই বিভিন্ন ধরনের গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত এলাকা যেখানে নানা ধরনের জীব-জন্তু, পাখি, পোকামাকড়, অণুজীব ইত্যাদি প্রাকৃতিকভাবে নির্বিঘ্নে বসবাস করে তাকে বন বলা হয়। বনাঞ্চলে গাছপালা, জীব-জন্তু ও পোকামাকড়গুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বেঁচে থাকে।

বন সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে বনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- ❒ প্রাকৃতিক বন ও
- ❒ কৃত্রিম বন।

প্রাকৃত্রিক বন

যে বনাঞ্চল মানুষের সহায়তা ছাড়া প্রাকৃত্রিক নিয়মে গড়ে উঠেছে তাকে প্রাকৃতিক বন বলা হয়। যেমন– সুন্দরবন, মধুপুরের শালবন, গজারী বন ইত্যাদি। পৃথিবীর অধিকাংশ বনাঞ্চল প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠেছে আফ্রিকার ঘন গহীন অরণ্য, আমাদের দেশের সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘন পাহাড়ি বনাঞ্চল সবই প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি।

কৃত্রিম বন

মানুষ দ্বারা সৃষ্ট বনাঞ্চল তথা বিভিন্ন এলাকায় নতুনভাবে গাছ লাগিয়ে যে বন সৃষ্টি করা হয়, তাকে কৃত্রিম বন বলে। বন বিভাগ কর্তৃক লাগানো চট্টগ্রামের সেগুন বন বা গামার বন কৃত্রিম বনের উদাহরণ। বর্তমানে ব্যাপকভাবে কৃত্রিম বনায়ন সৃষ্টির উদ্যেগে দেখা যাচ্ছে, এদের মধ্যে সড়ক বনায়ন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বসত বাড়ির পাশের বন সামাজিক বনায়নের অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে। মধুপুরের শালবনের মধ্যবর্তী ফাঁক স্থানগুলোতে কৃত্রিমভাবে শালের পাশাপাশি অন্যান্য উদ্ভিদ লাগানোর ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে।

বনের গুরুত্ব

কোন দেশের পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে সে দেশের বনাঞ্চলের পরিমাণের উপর। দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে সে দেশের সর্বমোট এলাকার শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক। পৃথিবীতে গাছপালাই সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে। আদি হতে মানব সভ্যতার বিকাশে বন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আদিকালে মানুষ বনের গাছে বাস করত; এই ছিল তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, তারা বনের ফলমূল খেয়েই বেঁচে থাকত। বর্তমানকালে ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গাছের ভূমিকা তুলনাহীন। মানবজাতীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান থেকে শুরু করে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও গাছের কোন বিকল্প নেই। বনাঞ্চল আছে বলেই বন্য জীব জন্তু বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়া বন মাটির ক্ষয়রোধ করে, মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ায়, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এছাড়াও উপকুলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে জীব ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় বেষ্টনী হিসাবে কাজ করে। এভাবে দেখা যায় বনের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব অবদানের প্রেক্ষিতে বনের গুরুত্বকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

- ❒ অর্থনৈতিক গুরুত্ব;
- ❒ পরিবেশগত গুরুত্ব;
- ❒ জীববৈচিত্র্য;
- ❒ চিত্তবিনোদন।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

অর্থনৈতিকভাবে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। বন থেকে প্রধানত কাঠ, জ্বালানি কাঠ, শিল্পের কাঁচামাল, ভেষজ উপাদান ইত্যাদি পাওয়া যায়। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়া হলো :

১. কাঠ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাঠের গুরুত্ব অতীব। মানুষের ঘরবাড়ি তৈরি ও আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠের বিকল্প নেই বললেই চলে। নদী-নালা, খাল-বিলের দেশ বাংলাদেশ, এখানকার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। নৌকা, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামসহ অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে কাঠের ব্যবহার সেই আদিকাল থেকেই। অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাঠের প্রয়োজন ও দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু বনাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের কাঠের উৎপাদন এ বর্ধিত চাহিদা মেটাতে পারছে না। এজন্য আমাদের কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ব্যাপকহারে লাগানো জরুরী হয়ে পড়েছে।

২. জ্বালানি কাঠ

রান্না– বান্না ও অন্যান্য কাজে জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে; এমনকি আদিকালে মানুষেরা শুকনা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাত। জানা যায় বাংলাদেশে জ্বালানি গ্যাস উল্লেখযোগ্য পরিমানে রয়েছে, কিন্তু গ্যাসের ব্যবহার কেবলমাত্র ঢাকা শহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ; খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডারে ভর্তি করে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। ফলে দেশের সর্বত্র জ্বালানীর ব্যাপক চাহিদা মেটাতে মানুষের কাঠের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অন্যদিকে দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে অধিকহারে বনাঞ্চলের গাছ কাটা হচ্ছে। যার ফলে গ্রামাঞ্চলে ইতোমধ্যেই গোবর ও ময়লা আবর্জনাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার বাড়ছে, যা ভূমির উর্বরতা শক্তির সহায়ক। তাছাড়া সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ইটের ভাটাতে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় জ্বালানি কাঠের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক।

৩. শিল্পোত্তর কাঁচামাল

অধিকাংশ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বনাঞ্চলের উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা লেখাপড়ার কাজে যে কাগজ ব্যবহার করি তার কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ, কাঠ, আখের ছোবড়া, পাট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। দেশের বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট মিলের কাঁচামাল হিসেবে সুন্দরবনের গেওয়া কাঠকে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া খুলনার হার্ডবোর্ড মিল, চন্দ্রঘোনার রেয়ন মিল এবং ম্যাচ ফ্যাকটরি সমূহের উৎপাদন বাঁশ ও কাঠের উপর নির্ভর করে। দেশের অনেক ছোট ছোট শিল্প– কারখানা এবং কুটির শিল্পের কাঁচামালের যোগান আসছে বন এবং গ্রামাঞ্চলের গাছ থেকে। কুটির শিল্পের মধ্যে আসবাবপত্র তৈরির কারখানা, বাঁশ, বেত ও হস্তশিল্পের যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে এ সব হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

৪. ভেষজ বা ওষুধি উদ্ভিদ

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার আদিকাল থেকেই। আদিকালে মানুষেরা তাদের বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে বিভিন্ন গাছপালা ও লতাপাতা ব্যবহার করত। এমনিভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বনাঞ্চলের উদ্ভিদ ব্যবহার হতে হতে আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রের উৎপত্তি ঘটে। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের কাঁচামাল হয় কোন উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ।

পরিবেশগত গুরুত্ব

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বন মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কোন দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য ঠিক রাখতে সে দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ ৭ ভাগের কম। কোন স্থানের বা অঞ্চলের আবহাওয়া সেকানকার ভূপ্রকৃতি, মাটি,নদ-নদী, সমুদ্রের অবস্থান ও বনাঞ্চল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন স্থানের অবস্থান নদ-নদী, সমুদ্রের অবস্থিতি ভূপ্রকৃতির উপর সার্বিক কোন পরিবর্তন ঘটানো মানুষের একার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আবহাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এ বনাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা মানুষের পক্ষে সম্ভব। বনের উদ্ভিদ নিম্নলিখিতভাবে আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে–

মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী শ্বাস- প্রশ্বাসের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। অন্যদিকে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সময় বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এমনিভাবে উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুল পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

বনাঞ্চলের উদ্ভিদ প্রশ্বেদন প্রক্ষিয় বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এ জলীয়বাষ্প পরবর্তীতে বৃষ্টিপাত ঘটাতে সহায়তা করে।

বনাঞ্চল ভূমিক্ষয় ও ভূমিধস রোধ করে।

জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্র বলতে জীবের প্রকরণ ও বিভিন্নতাকে বুঝায়। অর্থাৎ জীববৈচিত্র হচ্ছে উদ্ভিদ, প্রাণী ও বিভিন্ন প্রকার অণুজীবের প্রাপ্যতা, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা অনেক ফসল গাছের বন্য প্রজাতি জাত বনাঞ্চল হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমাদের খাদ্য ভাত যে ধান গাছ থেকে পাই, এ ধান গাছ কিন্তু পূর্বে এমন ছিল না ; ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন সংকরায়নের মাধ্যমে বর্তমানকালের ধান গাছের উৎপত্তি হয়েছে। আমাদের ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে হয়ত এখনও অনেক অজানা উদ্ভিদ বনাঞ্চলে আছে। এজন্য নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যক্তি, দেশ ও বিশ্বপরিবেশের সার্থে জীববৈচিত্র্য রক্ষা অতীব জরুরি।

চিত্তবিনোদনে বনের ভূমিকা

বিশ্বব্রহ্মান্ডে শহরের পরিমাণ তথা শহর এলকার বিস্তৃতি যেমনভাবে বাড়ছে, ঠিক তেমনিভাবে বাড়ছে শহুরে লোকসংখ্যা। আর শহুরে লোক মানে সে চলমান; তার যেন কোন বিরাম নেই। শহুরে মানুষ এভাবে কাজ করতে করতে একসময় হাঁপিয়ে ওঠে, মানুষ চায় বিশ্রাম, শরীর হয়ে পড়ে ক্লান্ত। চিত্তবিনোদন মন ও শরীরের এ অবসাদ দূর করে। বর্তমান কর্মচঞ্চল সমাজ জীবনে বন নানাভাবে চিত্ত বিনোদনে ভূমিকা পালন করে। বনের উন্মুক্ত পরিবেশে, নির্মল বাতাস, খোলা আকাশ, প্রবাহমান ঝরনা বা নদী, সবুজ গাছপালা, বণ্যপ্রাণী ইত্যাদি সব চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় উপাদান। মানুষের উপর এ সব উপাদানের প্রভাব দীর্ঘদিনের। এ কারণে বনের বেষ্টনীতে চিত্তবিনোদন একটু আলাদা, বৈচিত্র্যময় ও প্রাণবন্ত। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি উক্তির মাধ্যমে বনের গুরুত্বকে যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন– "দাও ফিরিরে সে অরণ্য লও এ নগর।"

সারমর্ম

- বন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের সমাবেশ।
- বন প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হতে পারে আবার কৃত্রিমভাবে একে সৃষ্টি করা সম্ভব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বনের গুরুত্ব অপরিসীম।
- অর্থনৈতিক দিক থেকে বন গুরুত্বপূর্ণ।
- মানুষের চিত্তবিনোদনের প্রথম আকর্ষণ বনাঞ্চল।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বনাঞ্চল রক্ষা করা জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বনাঞ্চল কতভাবে সৃষ্টি হতে পারে?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। কোন দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থের কি পরিমাণ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক?

(ক) ২০% (খ) ১৫%

(গ) ২৫% (ঘ) ৩০%

৩। বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ কত?

(ক) শতকরা ১৬ ভাগ (খ) শতকরা ৭ ভাগের কম

(গ) শতকরা ৯ ভাগ (ঘ) শতকরা ১৫ ভাগ

৪। নিউজপ্রিন্ট কোন উদ্ভিদ থেকে তৈরি করা হয়?

(ক) সুন্দরী (খ) বাঁশ

(গ) গোলপাতা (ঘ) গেঁওয়া

৫। উদ্ভিদ কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে?

(ক) অক্সিজেন ত্যাগ করে (খ) কার্বণ ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে

(গ) পানি ত্যাগ করে (ঘ) অক্সিজেন গ্রহণ করে

পাঠ-৫.২ : বনাঞ্চলের বিস্তৃতি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানচিত্রের সাহায্যে বন সম্পদের অবস্থা নির্দেশ করতে পারবেন।
- পাহাড়ি বনের বিস্তৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমতল ভূমির বন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের বন এলাকা

বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ১৭.০৯% অর্থাৎ প্রায় ২৪.৬ লক্ষ হেক্টর। নানা কারণে সকল বনভূমি এলাকা বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। এছাড়া বন সমস্ত দেশব্যাপী সমানভাবে বিস্তৃত নয়।বেশিরভাগ বনভূমি দেশের দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু বিস্তীর্ণ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে

চিত্র : মানচিত্রে বাংলাদেশের বনাঞ্চল।

বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। মানচিত্রে বনভূমির অবস্থান দেখানো হয়েছে। এদেশে প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষ- আচ্ছাদিত বনভূমির পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগের নিচে। অবস্থান ও বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে তিন ভাগে করা যায়। যথা–

(১) পাহাড়ি বন;
(২) সমতল ভূমির বন ও
(৩) ম্যানগ্রোভ বন।

(১) পাহাড়ি বন

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট এলাকা জুড়ে পাহাড়ি বন বিস্তৃত। দেশের মোট বন এলাকার অর্ধেকের বেশি এলাকা জুড়ে এ বন অবস্থিত। মোট পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৩.৬ লক্ষ হেক্টর। এ বনের প্রায় অর্ধেক এলাকা জুড়ে এখন গাছপালা নেই বললেই চলে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃক্ষ কর্তন এবং ব্যাপকভাবে ঝুম চাষের ফলে পাহাড়ি বনের অধিকাংশ এলাকা বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়ছে। এ সমস্ত বৃক্ষশূন্য এলাকাতে এখন পরিকল্পিত উপায়ে বৃক্ষরোপণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এ এলাকায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত চট্রগ্রাম ২৫০ সেমি, পার্বত্য চট্রগ্রাম ২২৫ সেমি, ও সিলেটে সর্বোচ্চ ৫০০ সেমি। এ অঞ্চলের মাটিতে হিউমাস বা জৈব পদার্থের আধিক্য হেতু মাটির রং কালো হয়। বাংলাদেশের অন্য যেকোন বনাঞ্চলের তুলনায় এ বনাঞ্চলে অধিক পরিমাণে চিরহরিৎ ও পত্রঝরা উদ্ভিদ জন্মে। গভীর উপত্যকা ও যেসব এলাকায় পানির প্রাচুর্য রয়েছে সেখানে ঘনস্তর বিশিষ্ট চিরহরিৎ উদ্ভিদ জন্মে। এ বনাঞ্চলে বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সেগুন, গর্জন, চাপালিশ, কড়ই, তেলসুর, হারগোজা, বৈলাম, মেহগনি, গামার, জারুল, চম্পা, ময়নাকাট ইত্যাদি উলে- খযোগ্য। তাছাড়া এ বনে প্রচুর পরিমানে বাঁশ জন্মে। বিভিণ্ন ধরণের পাখি ও উল্লুক, চিতাবাঘ, ভল্লুক, হাতি, বানর, হরিণ, বনমোরগ, গেছোব্যাঙ, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রাণী এ বনে দেখা যায়। বিষধর সাপ গোখরা এবং বৃহদাকৃতির অজগর সাপও এবনে দেখা যায়।

(২) সমতল ভূমির বন

বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং কুমিল্লা অঞ্চলের বনাঞ্চল নিয়ে সমতল ভূমির বন গঠিত। সাধারণত লোকালয়ের কাছাকাছি সমতল ভূমিতে এ ধরনের বনের সৃষ্টি। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ শাল। আমাদের দেশে সমতল ভূমির পরিমাণ প্রায় ১.২ লক্ষ হেক্টর। এ বনাঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৭৫ সেমি। এখানকার মাটিতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল নয়। এ অঞ্চলের মাটি লাল বালু সমৃদ্ধ ও অনুর্বর, ফলে শীতকালে মাটি শুকিয়ে যায়।এ বনাঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদগুলো হলো শাল, গজারী, অর্জুন, হরিতকি, আমলকি, সিধা, জারুল, কড়ই, জিগা, হলুদ, আদা, বনহলদি, কুচি ইত্যাদি। লোকবসতির নিকটবর্তী হওয়ায় গাছ কাটার চাপ এ বনের উপর অনেক বেশি। অনেকে বনের গাছ কেটে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরির কাজে লাগায়। আবার অনেকে গাছ কেটে সেখানে চাষাবাদ করে। বনের মধ্যে এভাবে গাছকেটে চাষাবাদ করার স্থানকে বাইদ বলে।এসব কারণে বনাঞ্চল প্রায় বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়ছে। বর্তমানে এসব বনাঞ্চলের খালি স্থানগুলোতে নতুনভাবে গাছ লাগানোর প্রচেষ্টা চলছে।এ বনে কৃত্রিমভাবে লাগানো গাছগুলোর মধ্যে–অর্জুন, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস উল্লেখযোগ্য।

(৩) ম্যানগ্রোভ বন

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল তথা খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলে এক বিশেষ ধরনের বনাঞ্চল পরিলক্ষিত হয়, এদেরকে ম্যানগ্রোভ বা লোনা পানির বনাঞ্চল বলা হয়। এ বনাঞ্চলের মাটি প্রতিদিন দুবার সমুদ্রের জোয়ারের লবণাক্ত পানি দ্বারা সিক্ত হয় বলে একে লোনা পানির বনাঞ্চলও বলা হয়। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী চট্টগ্রামের চকোরিয়া অঞ্চলে সুন্দরী বৃক্ষের আধিক্য হেতু, একে সুন্দরবনও বলা হয়। এ বনে সুন্দরী বৃক্ষের পাশাপাশি গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা, হাড়গোজা, ভোলা, কাকড়া, বাইন, গরাণ, পশুর, হিন্দল ইত্যাদি উদ্ভিদ জন্মে।ম্যানগ্রোভ বনের উদ্ভিদগুলো অন্যান্য বনের উদ্ভিদগুলো অপেক্ষা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়।এসকল উদ্ভিদে শ্বাসমূল তৈরি হয়। বনে মাটি সব সময় ভেজা বা কর্দমাক্ত থাকায় শ্বাসমূল তৈরি হয়। তাছাড়া এ বনের অধিকাংশ উদ্ভিদে বীজ গাছে থাকা অবস্থায় অঙ্কুরিত হয়। এ ধরনের অঙ্কুরোদগমকে সরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ বনের প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া এ বনে হরিণ, বানর, বনশূকর, অজগর, কুমির ও বিভিন্ন ধরনের পাখি বসবাস করে। সুন্দরবনে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে জন্মে গোলপাতা। গোলপাতা ঘরের ছাউনি ও ঘরের বেড়া তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এ বনে প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৬২২১ বর্গ কি.মি.। বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনের বিস্তৃতি এককভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম। বর্তমানে একে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে সুন্দরবন এলাকায় নদ-নদীর পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুন্দরী বৃক্ষের আগামরা রোগ দেখা দিয়েছে এবং ব্যাপকহারে সুন্দরীবৃক্ষ মারা যাচ্ছে। পরিকল্পিত উপায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুন্দরবনকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

সারমর্ম

- বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৪.৬ লক্ষ হেক্টর। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বৃক্ষ-আচ্ছাদিত মোট বনভূমির পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগের নিচে।
- অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বন তিন ধরনের–
- পাহাড়ি বন;
- সমতল ভূমির বন;
- ম্যানগ্রোভ বন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষ-আচ্ছাদিত বনের পরিমাণ কত?

(ক) শতকরা ৯ ভাগ (খ) শতকরা ১৬ ভাগ
(গ) শতকরা ২৫ ভাগ (ঘ) শতকরা ৭ ভাগের কম

২। সমতল ভূমির প্রধান বৃক্ষ কোনটি?

(ক) শাল (খ) গজারী
(গ) হরিতকি (ঘ) সেগুন

৩। বাংলাদেশে সুন্দরবনের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার?

(ক) ৬১২১ বর্গকিলোমিটার (খ) ৬২১১ বর্গকিলোমিটার
(গ) ৬২২১ বর্গকিলোমিটর (ঘ) ৬১১১ বর্গকিলোমিটর

৪। সুন্দরবনে কোন উদ্ভিদ সবচেয়ে বেশি জন্মে?

(ক) সুন্দরী (খ) গেওয়া
(গ) গোলপাতা (ঘ) হিন্দল

৫। গোলপাতা দেখতে কেমন?

(ক) গোলাকার (খ) লম্বা
(গ) উপ-বর্গকার (ঘ) প্যাঁচানো

পাঠ-৫.৩ : বনবিধি ও বন্য প্রাণী বিধি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বনবিধি বা বন আইন কি বলতে পারবেন।
- বন আইন অমান্যকারীর শাস্তির পরিমাণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বন্য প্রাণী বিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- বন্য প্রাণী বিধি লঙ্ঘনকারীর শাস্তির মাত্রা লিখতে পারবেন।

বনবিধি

কোন উদ্ভিদশূন্য অঞ্চলে নতুন করে বনাঞ্চল সৃষ্টি বা সরকারি বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটা, অপসারন, পরিবহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান রয়েছে। এ সব আইন বা বিধানগুলোকে বনবিধি বা বন আইন বলা হয়। বনভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এ উপমাহাদেশে ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয়। পরে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে এ আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন করে যা বন আইন ১৯৯০ নামে পরিচিত। এ আইনের ক্ষমতা বলে বনভূমি ও বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু বিধি–নিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং ঐ সব বিধি–নিষেধ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এ বিধি অনুসারে নিচের কাজগুলো করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ–

১। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সরকারি বনভূমি হতে বনজ সম্পদ আহরণ করা।

২। বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশ করা, ঘরবাড়ি তৈরি ও চাষাবাদ করা।

৩। বনাঞ্চলে গবাদি পশু চরানো।

৪। অনুমতি ছাড়া বনভূমি থেকে গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহন করা।

৫। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বনে আগুন দেওয়া, আগুন রাখা বা বহন করা।

উল্লিখিত যে কোন অপরাধ সংঘটনকারীর বিচার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হয়ে থাকে। অপরাধ সংঘটনকারীর কমপক্ষে এক বছর জেল সহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুবছর জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে।

বন্যপ্রাণী বিধি

বন্যপ্রাণী বনের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হিস্র বন্যপ্রাণী বনের মূল্যবান সম্পদের পাহারাদার হিসেবে কাজ করে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে একটি আইন প্রণয়ণ করেন যা, বাংলাদেশ বন্যাপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭৪ নামে পরিচিত। এ আইন দেশের সকল স্থানে প্রযোজ্য। এ আইন বলে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যার ক্ষেত্রে বিধি–নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

এ আইন অনুসারে নিম্মলিখিত কাজগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে–

১। শখের বশে বন্যপ্রাণী শিকার করা।

২। বিনা অনুমতিতে সরকারি বন থেকে যে কোন বন্যপ্যাণী শিকার করা কিংবা বিষ দ্বারা হত্যা করা অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় বন্য প্রাণী ধরা।

৩। বিনা অনুমতিতে বন্যপ্রাণী পোষা।

৪। শিকারি পাখি বা কুকুর ব্যবহার করে অন্য কোন বন্যপ্রাণী ধরা।

৫। বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল ধ্বংস করা।

উপরোক্ত অপরাধগুলো সংঘটনকারীর বিচার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হয়ে থাকে। এ প্রকার অপরাধে দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সর্বনিম্ন ছয় মাসের জেলসহ দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুবছরের জেলসহ জরিমানা হতে পারে।

সারমর্ম

বনভূমি ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয়। পরে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে এ আইনের সংশোধনী আনেন, যা বালাদেশ বন আইন ১৯৯০ নামে পরিচিত।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করেন, যা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭৪ নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বনবিধি কী নামে পরিচিত?

(ক) বন আইন ১৯২৭ (খ) বন আইন ১৯৯০

(গ) বন আইন ১৯৯৮ (ঘ) বন আইন ২০০০

২। বন আইন লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি কোনটি?

(ক) দুবছর জেল (খ) দুবছর জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমান

(গ) এক বছর জেল (ঘ) দুবছর জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা

৩। বাংলাদেশে প্রচলিত বন্যপ্রাণী বিধি কোন সালে প্রবর্তন করা হয়?

(ক) ১৯৭০ সালে (খ) ১৯৭২ সালে

(গ) ১৯৭৪ সালে (ঘ) ১৯৭৫ সালে

৪। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় সর্বনিম্ন শাস্তি কি?

(ক) ছয় মাসের জেলসহ দুই হাজার টাকা জরিমানা

(খ) এক বছরের জেলসহ দুই হাজার টাকা জরিমানা

(গ) দুবছরের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা

(ঘ) উপরের সবকয়টি সঠিক

পাঠ-৫.৪ ঃ বনজ নার্সারি স্থাপন পরিকল্পনা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- নার্সারী স্থাপনের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ অনুধাবন করতে পারবেন।
- প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- একটি আদর্শ নার্সারির নক্সা তৈরি করতে পারবেন।

নার্সারি

যে কোন ধরনের বন কিংবা বাগান তৈরি করতে সুস্থ, সবল ও নির্ধারিত মানের চারাগাছ প্রয়োজন। সুস্থ, সবল ও ভালো মানের চারা না হলে ফসল ভালো হয় না। ভালো মানের চারা উৎপাদনের প্রয়োজন হয় নার্সারির। নার্সারির সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, যে জায়গায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফুল, ফল, শাকসবজি ও বনজ বৃক্ষের চারা উৎপাদন ও কলম তৈরি করা হয় এবং রোপনের পূর্ব পর্যন্ত বর্ধনশীল চারা বা কলমের উপযুক্ত যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে নার্সারি বলে। সুতরাং নার্সারি যেকোন গাছপালার চারা বা কলম উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান। এতে নির্দিষ্ট মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ চারা বা কলম উৎপাদন করে তা বিক্রয়ের জন্য রক্ষণ করা হয়। নার্সারি শুধুমাত্র বীজ থেকে চারা উৎপাদনের কেন্দ্র নয়। নার্সারিতে চারা উৎপাদন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কলম থেকে চারা তৈরি, রূপান্তরিত মূল বা শাখা থেকে গাছের বংশবিস্তারের জন্যকলম তৈরি করা হয়। এছাড়া আধুনিক নার্সারিতে উন্নতমানের মূল্যবান চারা উৎপাদনের জন্য টিসুকালচার ল্যাবরেটরি এবং গ্রীনহাউজ থাকতে পারে।

নিচে সংক্ষেপে নার্সারীর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো–

১। নার্সারিতে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে চারা উৎপাদন করা যায় এবং তা সময়মতো সরবরাহ করা যায়।

২। অনেক উদ্ভিদের বীজ গুদামজাত করা যায় না । দুই-একদিনের মধ্যে এদের জীবনীশক্তি হারিয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে নার্সারির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেমন– শাল, গর্জন, তেলশুর ইত্যাদি।

৩। যে সব উদ্ভিদের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যায় না কিংবা বীজের চারা থেকে ফলন ভাল হয় না এদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের কলমের চারা বা টিসুকালচার চারা পেতে হলে নার্সারির প্রয়োজন যেমন– বাঁশ, কদম, জারুল ইত্যাদি।

৪। নার্সারিতে বিভিন্ন বয়সের চারা পাওয়া যায়।

৫। চারা বিতরণ ও বিপণনের সুবিধা হয়।

৬। সামাজিক বনায়ন ও বন সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের সফলতার জন্য নার্সারি প্রয়োজন।

৭। নার্সারি ব্যবসা লাভজনক। শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, বেকার যুবক-যুবতি, দুঃস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও কর্মহীন মানুষ অল্প পুঁজি নিয়ে স্বল্প জমিতে নার্সারি স্থাপন করে স্বচ্ছলভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

নার্সারির প্রকারভেদ

অর্থনৈতিক বিবেচনায় প্রধানত নার্সারিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) স্থায়ী নার্সারি ও

(খ) অস্থায়ী নার্সারি;

নার্সারি স্থাপনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার। একটি মনোরম আকর্ষণীয় নার্সারি স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকলে কাজ সহজ এবং খরচ কম হয়। নার্সারি স্থাপনের পূর্বে একজন পরিকল্পনাকারীর যেসব বিষয় প্রথমেই বিবেচনায় আনতে হয় তা হলো :

১। স্থান নির্বাচন ২। ভূমি উন্নয়ন ৩। বেড়া বা বেষ্টনী নির্মাণ। ৪। নার্সারির নক্সা তৈরি। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. স্থান নির্বাচন : নার্সারি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্থান নির্বাচনে ভুল হলে নার্সারির উৎপাদন ও লাভ দুটিই ব্যাহত হয়। উত্তম স্থান নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য বিষয় হলো–

ক। নির্বাচিত জমি উঁচু, সমতল এবং বর্ষাকালে জলমুক্ত থাকবে।
খ। জমির মাটি উর্বর বেলে দো-আঁশ ও কাকরমুক্ত হবে।
গ। নার্সারির জায়গায় প্রচুর আলো ও বাতাসের সুবিধা থাকবে।
ঘ। পানি সেচ ও নিকাশের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
ঙ। মালামাল ও উৎপাদিত চারা পরিবহনের জন্যউন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
চ। নার্সারি এলাকার জলবায়ু ও আবহাওয়া নার্সারি স্থাপনের অনুকুল হতে হবে।
ছ। নার্সারি ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা থাকবে।
জ। এলাকার জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে।

পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের জন্য ১ বর্গমিটার বা ১০ বর্গফুট নিম্নোক্ত মাপের পলিব্যাগের প্রয়োজন হয়।

১৫ সে.মি. ∞ ১০ সে.মি. মাপের ব্যাগ ২২৫ টি

২৫ সে.মি. ∞ ১৫ সে.মি. মাপের ব্যাগ ১০০ টি

৪০ সে.মি. ∞ ২৩ সে.মি. মাপের ব্যাগ ৩৬ টি

নার্সারির বেডে চারা উৎপাদনের জন্য ১ বর্গমিটার বা ১০ বর্গফুট নিম্মোক্ত চারা সংকুলান হয়।

চারা হতে চারার দূরত্ব	চারার সংখ্যা
৫ সে.মি. ∞ ৫ সে.মি.	৪০০ টি
১০সে.মি. ∞ ৫ সে.মি.	২০০ টি
১০ সে.মি. ∞ ১০ সে.মি.	১০০ টি

একটি ৪০ মিটার ∞ ৪ ফুট সাইজের বেড হতে ১৫ সে.মি. ∞ ১০ সে.মি. ব্যাগের ৪০০০ টি চারা, ২৫ সে.মি. * ১৫ সে.মি. ব্যাগের ১৭০০ টি চারা ও ৪০ সে.মি. * ব্যাগের ৬২৫ টি চারা তৈরি করা যায়।

২. ভূমি উন্নয়ন : যেখানে নার্সারি স্থাপন করা হবে সেখানকার সব গাছপালা, লতা-গুল্ম কেটে ভূমিকে পরিষ্কার করতে হবে। গাছের মুথা ও পাথরের টুকরা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে। নার্সারির এলাকা যদি উচু নীচু থাকে তাবে তা ভালভাবে সমান করতে হবে। নার্সারির মাটি বেলে দো–আঁশ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে বাহির থেকে বেলে দো–আঁশ মাটি এনে ভরাট করতে হবে।

৩. বেড়া বা বেষ্টনী নির্মাণ : নার্সারিতে উৎপাদিত চারা ও কলমকে গবাদি পশু ও অন্যান্য উপদ্রব থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির হাত থেকে নার্সারির চারা

রক্ষা করার জন্য চতুস্পার্শে বেড়া দিতে হবে। সাধারণত নার্সারিতে পাঁচ ধরনের বেড়া দেওয়া হয়। যথাঃ

ক. আর, সি, সি, পিলাযুক্ত কাঁটা তারের বেড়া;

খ. ইটের দেওয়াল;

গ. লোহার জালের বেড়া;

ঘ. জীবন্ড় গাছের বেড়া;

ঙ. বাঁশের বেড়া।

প্রথম চারটি পদ্ধতি স্থায়ী নার্সারির জন্য প্রযোজ্য তবে অস্থায়ী নার্সারির জন্য বাঁশের বেড়া ব্যবহার করা হয়।

৪. **নার্সারির নক্সা তৈরি :** নার্সারি স্থাপন পরিকল্পনা উপযুক্ত নক্সা তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নক্সা অনুযায়ী পরবর্তীতে নার্সারি স্থাপন করা হয়। একটি নার্সারির নক্সায় নিম্নলিখিত অংশসমূহ পরিকল্পিত সাজানো থাকে।

১. **অফিস ও বাসস্থান :** নার্সারি পরিচালনায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য অফিস থাকবে। এ ছাড়া এদের থাকার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা ও আদর্শ নার্সারিতে থাকে।

২. **নার্সারি ব্লক :** নার্সারিতে চারা লাগানোর জন্য যে স্থান থাকে তাকে নার্সারি **ব্লক** বলে।

৩. **নার্সারি বেড ও পরিদর্শন পথ :** বীজতলা ও নার্সারিতে কর্মরত লোকজনের যাতায়াতের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ নার্সারিতে থাকে।

৪. **পার্শ্বনালা ও নর্দমা :** সেচ ও নিকাশের জন্য পার্শ্বনালা ও নর্দমা প্রয়োজন।

৫. **পলিব্যাগ ভর্তির অস্থায়ী শেড :** পলিব্যাগে মাটি ভর্তির জন্য নির্ধারিত স্থান।

৬. **কম্পোষ্ট তৈরির গর্ত :** নার্সারিতে বিভিন্ন আর্বজনা পচিয়ে কম্পোস্ট তৈরি করে তা মাটির উর্বরতা বাড়াতে ব্যবহার করা হয়। এজন্য নার্সারিতে নির্দিষ্ট স্থান থাকা প্রয়োজন।

৭. **সীড বেড ঃ** বীজ থেকে চারা উৎপাদনের নির্ধারিত স্থান। সব বীজ পলি ব্যাগে উত্তোলন করা হয় না। সরাসরি বীজ হতে চারা উৎপাদন করে বাজারজাত করা হয় এমন বীজ যে স্থানে লাগানো হয় সে স্থানকে সীড বেড বলা হয়। প্রত্যেক নার্সারিতে এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকতে হবে।

৮. **গ্রীন হাউজ ঃ** গ্রীন হাউজ হলো কাঁচ বা ফাইভার কাঁচের তৈরি বিশেষ ঘর, যেখানে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত থাকে। সব ধরনের চারা উত্তোলনের জন্য এর প্রয়োজন হয় না। কিছু কিছু প্রজাতির গাছের চারা বা কলম উৎপাদনের জন্য এর প্রয়োজন হয়। যেমন– বাঁশের কলম (কাটিং) বা টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত যে কোন গাছের চারা বাজারজাতকরণের পূর্বে গ্রীন হাউজে রাখা আবশ্যক।

৯. **মাটি রাখার স্থান :** টব ও পলিব্যাগের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি রাখার স্থান।

১০. **পানির উৎস :** গভীর বা অগভীর নলকূপ বা পুকুর ইত্যাদি।

উল্লিখিত অংশসমূহ পরিকল্পিতভাবে সাজালে কম জায়গায় অপেক্ষাকৃত সুন্দর নার্সারি তৈরি করা যাবে। নার্সারি বেডসমূহ পূর্ব–পশ্চিমে লম্বালম্বি হলে উত্তম, এতে সূর্যের আলো প্রতিটি বেডে সমানভাবে পড়বে। দুটি বেডের মধ্যে ৪৫-৫০ সে.মি. দূরত্ব রাখাতে হবে যাতে একজন লোক বসে কাজ করতে পারে। নার্সারি বেড সাধারণতঃ ১০-১২০ ১৫-২০ মিটার মাপের হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনে এবং জায়গার অনুপাতে দৈর্ঘ্য কিছুটা কম-বেশী করা

যেতে পারে। প্রধান পরিদর্শন পথ ৩-৪ মিটার এবং পার্শ্ব পরিদর্শন পথ ১-২ মিটার হয়। নার্সারিতে পানি নিকাশের জন্য প্রধান নিকাশ নালা ও শাখা নিকাশ নালা থাকতে হবে। নিচে একটি আদর্শ নার্সারির নক্সা দেওয়া হলো। আপানার আদর্শ নার্সারিটির নক্সা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন এবং নিজেদের খাতায় আঁকার অভ্যাস করুন। এটি ভালোভাবে আঁকতে পারলে সহজেই যে কোন নিধারিত জায়গায় নার্সারি তৈরি করার নক্সা ও আঁকতে পারবেন।

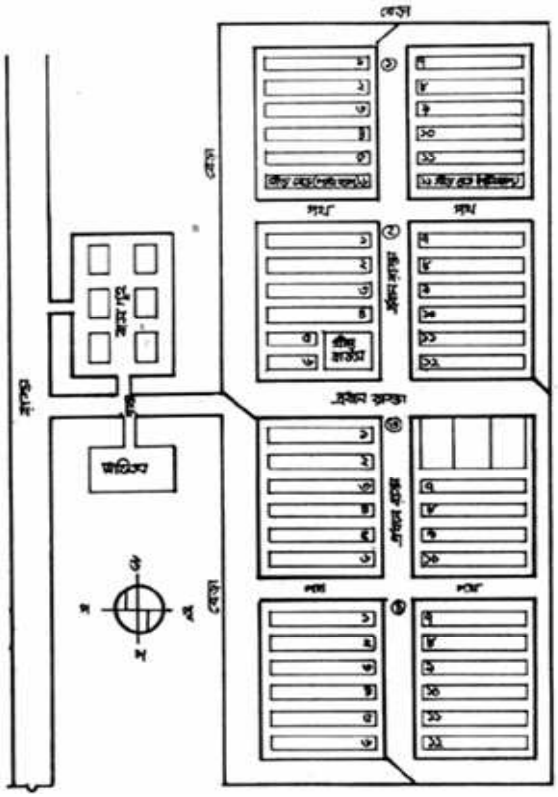

চিত্র - ৫২ : সমতল ভূমিতে একটি নার্সারি পরিকল্পনা

সফলভাবে নার্সারি ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু সুযোগ সুবিধে এবং নার্সারি স্থাপনকারীর কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. পানি সরবরাহ ও এর সহজলভ্যতা।
২. বীজ সংগ্রহ ও গুদামজাতকরণ ।
৩. যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক উপকরণ সংগ্রহ।
৪. মাটি, গোবর, কম্পোস্ট, রাসায়নিক সার ইত্যাদি সংগ্রহ।
৫. নার্সারি বেড তৈরি, বীজ বপন, পলিব্যাগে চারা উত্তোলন কৌশল ইত্যাদি।
৬. বিভিন্ন প্রকার ফুল-ফল, শাকসবজি ও বনজ গাছপালা সম্পর্কিত জ্ঞান।
৭. বিপণন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান।

সারমর্ম

সফল নার্সারি স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। নার্সারি স্থাপনের পূর্বে স্থান নির্বাচন, ভূমি উন্নয়ন, বেড়া বা বেষ্টনী নির্মাণ ও নার্সারির নক্সা তৈরি প্রথমেই বিবেচনায় আনতে হয়। উল্লিখিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বিবেচনায় এনে সুপরিকল্পিতভাবে এগোতে পারলে সহজেই একটি সুন্দর নার্সারি স্থাপন সম্ভব। অর্থনৈতিকভাবে নার্সারি দুই প্রকার, যথা– স্থায়ী নার্সারি ও অস্থায়ী নার্সারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। একটি আদর্শ নার্সারি বেড সাধারণত কোন মাপের হয়ে থাকে?

(ক) ৫-৬ ∞ ১-৩ মিটার (খ) ১০-১২ ∞ ১৫-২০ মিটার

(গ) ৭-১৫ ∞ ১৫-২০ মিটার (ঘ) ৬-৮ ∞ ২৫-৩০ মিটার

২। নার্সারি স্থাপনের জন্য প্রধান চারটি বিবেচ্য বিষয় হলো–

(ক) স্থান নির্বাচন, ভূমি উন্নয়ন, বেড়া বা বেষ্টনী নির্মাণ ও বীজ সংগ্রহ

(খ) পানি সরবরাহ, ভূমি উন্নয়ন, বেড়া বা বেষ্টনী নির্মাণ ও নক্সা তৈরি

(গ) স্থান নির্বাচন, ভূমি উন্নয়ন, বেড়া বা বেষ্টনী নির্মাণ ও নক্সা তৈরি

(ঘ) স্থান নির্বাচন, পলিব্যাগ তৈরি, বেড়া বা বেষ্টনী নির্মাণ ও নক্সা তৈরি

৩। নিচের কোনটি নার্সারি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত নয়?

(ক) বীজ সংগ্রহ ও গুদামজাতকরণ (খ) পানি সরবরাহ

(গ) মাটির টব তৈরি (ঘ) পলিব্যাগে চারা উত্তোলন

৪। অর্থনৈতিক বিবেচনায় নার্সারি প্রধানত কত ধরনের হয়ে থাকে

(ক) দু ধরনের (খ) তিন ধরনের

(গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের।

পাঠ ৫.৫ ঃ নার্সারিতে চারা উৎপাদন পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বীজ থেকে চারা উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে কলমের চারা উৎপাদন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কলমের চারার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নার্সারিতে ফুল-ফল, শাকসবজি ও বনজ বৃক্ষের চারা উৎপাদন করা হয়। চারা উৎপাদন প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–

(ক) বীজ থেকে চারা উৎপাদন

(খ) গাছের বিভিন্ন অংশ তথা কলমের সাহায্যে চারা উৎপাদন

(ক) বীজ থেকে চারা উৎপাদন

সাধারণত সবজি ও বনজ বৃক্ষের চারা বীজ থেকে সরাসরি উৎপাদন করা হয়। সব সময় ভালো গাছ থেকে ভালো বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজ থেকে কম সময়ে ও তুলনামূলকভাবে কম পরিশ্রমে অধিক চারা উৎপাদন করা যায়। বীজ থেকে উৎপাদিত চারার প্রধান শিকড় নষ্ট হয় না এবং বনজ বৃক্ষের ক্ষেত্রে গাছের কান্ড খুব লম্বা ও মজবুত হয়। তবে বীজ থেকে উৎপাদিত চারা হুবহু মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য নাও পেতে পারে। সেজন্য ফুল ও ফল জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সাধারণত কলমের সাহায্যে চারা উৎপাদন করা হয়। কলমের সাহায্যে উৎপাদিত চারায় মাতৃগাছের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে। বীজ থেকে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিশোধন সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা আবশ্যক।

বীজ সংগ্রহ- নার্সারিতে অনেক উদ্ভিদের চারা বীজ থেকে উৎপাদন করা হয়। নার্সারিতে রোপণের জন্য বা সরাসরি বপণের জন্য সাধারণত দুটি উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যথা-

১. স্থানীয় উৎস
২. বিদেশী উৎস

ভালো বীজ পেতে হলে সুস্থ, সবল মাতৃগাছ থেকে পরিপক্ব, রোগমুক্ত ও পরিপুষ্ট বীজ সংগ্রহ করতে হবে। আদর্শ মাতৃগাছের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন–

১। মাতৃগাছ সুস্থ ও সবল হতে হবে।
২। বয়স মাঝারি ধরনের হবে।
৩। গাছটির সুন্দর মুকুট ও ডালপালা থাকবে। এখানে মুকুট হলো গাছের মাথার অংশ।
৪। পরিপুষ্ট ফল ও বীজ উৎপাদনে সক্ষম হতে হবে।

নির্বাচিত মাতৃগাছ হতে বীজ সংগ্রহের পর তা শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, কোন কোন উদ্ভিদের বীজ সংরক্ষণের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলে। এসব ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব বীজতলায় বীজ রোপণ বা পবন করতে হবে। যেমন– শাল, কড়ই, কাঁঠাল ইত্যাদি। বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম। কোন কোন উদ্ভিদের পাকা রসাল ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যেমন– আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি। আবার কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা শুষ্ক ফল থেকে সংগ্রহ করা

হয়। বীজ সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে বীজ যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদের ফল পাকার মৌসুমি অনুযায়ী বীজ সংগ্রহ করতে হয়। স্বল্প জীবাণু শক্তিসম্পন্ন প্রজাতির বীজ আমদানি করা হয় না। বনজ মধ্যে সাধারণত ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি ও ম্যানজিয়াম এর বীজ আমদানি করা হয়। বীজ আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে বীজে ক্ষতিকারক কোন জীবাণু (ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া) নাই এ ধরনের একটি সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন বিভাগ এ ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান করে। তবে সার্টিফিকেট প্রদানের আগে বীজকে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে রোগমুক্ত করা হয়।

বীজ সংরক্ষণ

অনেক সময় সংগৃহীত বীজ সাথে সাথেই রোপণ বা বপন করা যায় না। সেক্ষেত্রে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত বীজকে গুদামজাত করাকে বীজ সংরক্ষণ বলে। সঠিক সময়ে যথাযথ নিয়মে বীজ সংরক্ষণ না করলে তা পোকা ও রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সাধারণত বীজ সংরক্ষণ করতে হলে বীজে প্রয়োজনীয় কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক মিশিয়ে নেওয়া হয়। শুষ্ক, ঠান্ডা ও কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা সম্পন্ন স্থানে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। বীজ সংরক্ষণের সময় বীজের নাম, সংগ্রহের উৎস, বীজের পরিমাণসহ অন্যান্য বিবরণ বীজ ট্যাগে লিখে প্রতিটি প্যাকেটে এঁটে দিতে হয়। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বীজ সংরক্ষণের আগে তার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বীজ পরিশোধন

বীজ বপন বা রোপণের পূর্বে বীজকে শোধন করা উত্তম। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম হার বেড়ে যায় এবং সুস্থ সবল চারা পাওয়া যায়। বীজ পরিশোধনের পদ্ধতি নিম্নরূপ :

- ❒ প্রথমে পানিতে ভাসিয়ে চিটা ও অপুষ্ট বীজকে আলাদা করা হয়।
- ❒ বীজের ধরন অনুযায়ী শক্ত আবরণের বীজ নির্দিষ্ট সময় পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। যেমন– কড়ই (৪৮ ঘন্টা), পাইন(২৪ ঘন্টা), খয়ের (১-২ দিন)।

ফুটন্ত পানি ব্যবহার করে সিম জাতীয় কিছু সংখ্যক শক্ত খোসার বীজকে পরিশোধন করা হয়। এক্ষেত্রে ফুটন্ত পানিতে (১০৪$^{\circ}$ সে. এর নিচে) বীজসমূহ ১-৩ মিনিট কাল রেখে পরে সাধারণ পানিতে ২৪-৪৮ ঘন্টার মতো রাখতে হয়। উদাহরন– ইপিল-ইপিল, বাবলা, কৃষ্ণচূড়া, আকাশমনি ইত্যাদি।

- ❒ যদি বীজ ছত্রাক বা অন্যান্য জীবাণুবাহিত হয় তবে বীজকে ১ ভাগ ফরমালিন ও ৪০০ ভাগ পানির মিশ্রণে তৈরি দ্রবণে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। অথবা ০.১% সালফিউরিক এসিড দ্রবণে ১০ মিনিট ভিজিয়েও বীজশোধন করা সম্ভব। উভয় ক্ষেত্রে শোধনের পর বীজকে সাধারণ পানি দ্বারা ভালোভাবে ধুতে হয়।
- ❒ এছাড়া ভিটাভেক্স ২০০ এর নির্দিষ্ট মাত্রার দ্রবণে বীজ কয়েক মিনিট ভিজিয়ে রেখে অতঃপর সাধারণ পানি দ্বারা ধৌত করে বীজ শোধন করা যায়।

বীজের পরিমাণ নির্ণয়করণ

কি পরিমাণ চারা নার্সারিতে উৎপাদন করতে কতটুকু পরিমাণ বীজের প্রয়োজন তা জানা প্রয়োজন। নার্সারিতে চাহিদানুযায়ী চারার জন্য প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ দুটি সূত্র দ্বারা নির্ণয় করা যায়।

নিচের সূত্রের ব্যবহার করে নির্ণয় করা যায় :

(১) মোট বীজের সংখ্যা $= \frac{(A \times N)+B(A+N)}{G \times T \times P}$

(২) মোট বীজের ওজন $= \frac{\text{মোট বীজের সংখ্যা}}{W}$

এখানে, A = বাগানের জমির পরিমাণ
N = প্রতি হেক্টর চারার সংখ্যা
B = শূন্যস্থান পূরণ (১০%)
G = অঙ্কুরোদগমের হার (সাধারণত ৮০%)
T = গাছের হার (চারা উঠানো ও মরে যাবার পর যা থাকে, সাধারণত ৭০-৮০%)
P = রোপণযোগ্য চারা (সাধারণত ৮৫%)
W = প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ

(খ) কলমের সাহায্যে চারা উৎপাদন

সাধারণত বীজ দ্বারা সকল উদ্ভিদের উৎপাদিত চারা অনেক সময় গুণগতভাবে মাতৃগাছের অনুরূপ হয় না। এসব ক্ষেত্রে গাছের অঙ্গজ অংশ যেমন– মূল, কান্ড, পাতা, কুঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে চারা তৈরির পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়। মূল, কান্ড, পাতা, কুঁড়ি ইত্যাদির সাহায্যে চারা তৈরির পদ্ধতিকে কলম বা অঙ্গজ বংশবিস্ত্মর বলে। পাথরকুচির পাতা থেকে নতুন চারা গাছ জন্মানো কিংবা বিভিন্ন উদ্ভিদের কচি ডাল বা শাখা মাটিতে রোপণ করে নতুন গাছ উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সবাই কম–বেশি জানি। এসবই হলো কলমের সাহায্যে চারা উৎপাদন। প্রধানত পাঁচ ভাগে কলমের চারা উৎপাদন করা হয়। যথা–

১. কর্তন বা ছেদ কলম : এক্ষেত্রে সরাসরি কচি ডাল কেটে মাটিতে লাগিয়ে চারা তৈরি করা হয়। যেমন– সজিনা, শিমুল, লেবু, ডালিয়া, গাদা ইত্যাদি।

চিত্র- ৫৩ : কর্তন বা ছেদ কলম।

২. দাবা কলম : এক্ষেত্রে গাছের শাখার খানিক মাটিতে চাপা দিয়ে তাতে মূল গজিয়ে মাতৃগাছ থেকে আলাদা করা হয়। যেমন : লেবু, পেয়ারা, লিচু, সফেদা ইত্যাদি।

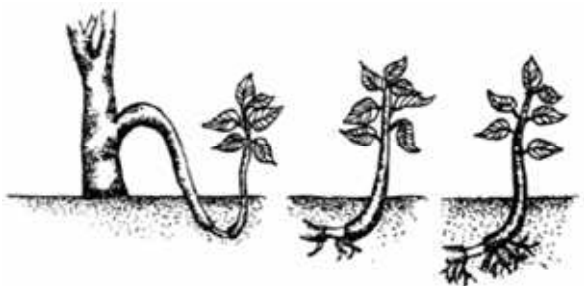

চিত্র : ৫৪ : দাবা কলম।

৩. গুটি কলম : নির্বাচিত গাছের ডালের ৩-৪ সে.মি. পরিমাণ অংশের ছাল তুলে গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে গুটি তৈরি করে চট দিয়ে আটকে দিতে হয়। বর্ষাকালে সাধারণত লিচু, ডালিম, লেবু, আম, পেয়ারা, জামরুল ইত্যাদিকে এ ধরনের কলম করে চারা তৈরি করা হয়।

চিত্র - ৫৫ : গুটি কলম

৪. জোড় কলম : এক্ষেত্রে একই জাতের দুটি গাছের কান্ডকে পরিমিত চেঁছে একত্রে বেঁধে দিলে ২-৩ মাসের মধ্যে জোড়া লেগে যায়। অতঃপর কাঙ্ক্ষিত গাছের অন্যটির নিচের অংশ কেটে আলদা করে কলমের চারা পাওয়া যায়। আমের ক্ষেত্রে জোড় কলম উত্তম। এছাড়া সফেদা, লেবু, লিচু, আঙ্গুর, পেয়ারা প্রভৃতি গাছে এ জাতীয় কলম তৈরি হয় করা যায়।

চিত্র - ৫৬ : জোড় কলম।

৫. চোখ কলম : পাতা বা ডালের সংযোগ স্থানের কুঁড়িকে বিশেষ পদ্ধতিতে অন্য উদ্ভিদে স্থানান্তরিত করাকে চোখ কলম বলে। গোলাপ, লেবু, কুল প্রভৃতি উদ্ভিদে এ কলম ব্যবহৃত হয়। কুলের ক্ষেত্রে টক কুল গাছকে চোখ কলমের সাহায্যে মিষ্টি কুলে রূপান্তরিত করা যায়।

চিত্র : ৫৭ : চোখকলম

কলমের চারাতে মাতৃগাছের গুণাগুণ থাকে। এছাড়া টিসুকালচার পদ্ধতিতেও উদ্ভিদের চারা তৈরি করা যায়। উদ্ভিদের বর্ধিষ্ণু কোষ কলাকে বিশেষ কৌশল নির্ধারিত মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ লালন–পালন করলে তা থেকে নতুন চারা উৎপন্ন হয়। তবে সকল ধরনের কলমের চারা তৈরিতেই খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি হবে।

সারমর্ম

নার্সারিতে প্রধানত বীজ এবং কলমের সাহায্যে চারা উৎপাদন করা হয়। বনজ বৃক্ষের চারা প্রধাণত বীজ থেকে এবং ফুল ও ফলের চারা কলমের সাহায্যে উৎপাদন করা হয়। বীজের চারার প্রধান মূল অক্ষত থাকে কিন্তু কলমের চারায় মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি আদর্শ মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য নয়?

(ক) মাতৃগাছ সুস্থ ও সবল হবে (খ) মাতৃগাছ অধিক বয়স্ক হবে

(গ) মাতৃগাছ সুন্দর মুকট ও ডালপালা সম্পন্ন হবে (ঘ) মাতৃগাছের বীজ রোগা ও পোকামুক্ত হবে

২। বীজ শোধনের সময় বীজকে ফুটন্ত পানিতে (১৪০$^{\circ}$ সে. এর নিচে) কত সময় ডুবিয়ে রাখতে হয়?

(ক) ১-৩ মিনিট (খ) ১০-২০ সেকেন্ড

(গ) ১-৩ ঘণ্টা (ঘ) ৫-১০ মিনিট

৩। লিচু, ডালিম ও লেবুতে সাধারণত কোন ধরনের কলমের চারা উৎপাদন করা হয়?

(ক) চোখ কলম (খ) জোড়া কলম

(গ) কর্তন বা ছেদ কলম (ঘ) গুটি কলম

৪। কোন কলমের সাহায্যে টক ফলকে মিষ্টি ফুলে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

(ক) চোখ কলম (খ) জোড়া কলম

(গ) ছেদ কলম (ঘ) গুটি কলম।

পাঠ-৫.৬ : নার্সারিতে বেড তৈরি ও বেডে চারা উৎপাদন

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নার্সারিতে চারা উৎপাদনে ব্যবহৃত বেডের ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাটিতে চারা উৎপাদনের জন্য বেড তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা করতে পারবেন।
- পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের জন্য বেড তৈরি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কোন একটি নার্সারিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কোথাও গাছের চারা উঁচু করা বেডে অর্থাৎ মাটিতে একসাথে বেড়ে উঠছে। আবার কোথাও ছোট ছোট পলিব্যাগে ঘন করে সারিবদ্ধভাবে অনেক চারা জন্মানো থাকে। মাটিতে কিংবা পলিব্যাগে যেখানে চারা উৎপাদন করা হোক না কেন বেড তৈরি করা প্রয়োজন। ফলে অল্প জায়গায় অনেক চারা উৎপাদন করা যায় এবং চারার সঠিকভাবে যত্ন করাও সহজ হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদনের জন্য প্রধানত দুই ধরনের বেড ব্যবহার করা হয়। যথা–

১. সরাসরি মাটিতে বেড চারা উৎপাদন।

২. পলিব্যাগে বা ছোট টবে চারা উৎপাদন।

মাটিতে চারা উৎপাদনের জন্য বেড তৈরি :

প্রথমে জমিটিকে প্রয়োজনমত সমান করে নিন। অতঃপর জমির ক্ষেত্রফল অনুযায়ী ১০০ ১.৩,৭ ০০ ১.৩, ১৩ ০০ ১.৩, ৫০০ ১.৩, ২ ০০ ১.৩ মিটার আকারের সীমানা ঠিক করুন। মনে রাখবেন, নার্সারি বেড পূর্ব–পশ্চিম লম্বালম্বিভাবে করা উত্তম। এতে চারা পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায়। নির্ধারিত স্থানটিতে লতা-পতা, আগাছা কিংবা যে কোন অপ্রয়োজনীয় গাছ থাকলে তা কেটে পরিষ্কার করুন। এ কাজটি সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে করতে হবে। আগাছা পরিষ্কারের পর ১৫-২০ সে.মি. গভীর করে কোদাল দিয়ে ভালোভাবে কুপিয়ে নিন। এ অবস্থায় দু'চারদিন রেখে দিন যাতে ঢেলাগুলো কিছুটা শুকিয়ে যায় এর পর আগাছা গাছের শিকড়, পাথরসহ অন্যান্য অপ্রজনীয় জিনিস বেছে পরিষ্কার করুন এবং মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে মাটি ঝুরঝুরে করে ফেলুন। তবে মাটি যদি এঁটেল প্রকৃতির হয়ে থাকে তবে অন্য সুবিধাজনক স্থান থেকে দো–আঁশ মাটি এনে ঝুরেঝুরে মাটির ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। যদি পুরাতন বেড হয় তবে মাটি কোদাল দিয়ে কুপলেই যথেষ্ট।

এজিং তৈরি

বেড তৈরি করার পর এতে সরাসরি বীজ বপন বা রোপণ করলে কিনারার চারাগুলো বৃষ্টির পানির স্রোতে নষ্ট হবে। সুতরাং নার্সারি বেডটিকে সুন্দর ও মজবুত রাখার জন্য এর চারদিকে বেষ্টনী দেয়া প্রয়োজন। নার্সারি বেডের মাটিকে চারদিক থেকে আটকে রেখে সুরক্ষিত করার কৌশলকে এজিং বলে। ছোটবাঁশ বা কাঠ (উচ্চতা ০.৩ মিটার) বা ইটের সাহায্যে প্রতিটি বেডের চারদিকে এজং তৈরি করুন।

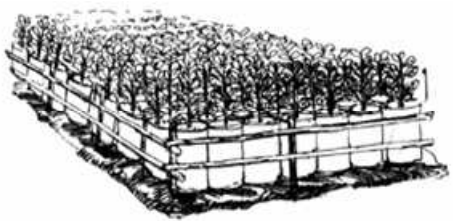

চিত্র- ৫৮ : এজিং

বেডের মাটি পরিশোধন

মাটিতে যদি রোগ জীবাণু থাকার সম্ভাবনা থাকে তবে এলাকা বিশেষ ১৩০০ ১.৩ মি. সাইজের প্রতিটি বেডে ২ কেজি গ্যামাক্সিকন অথবা ফরমালডিহাইড প্রয়োগ করে মাটিকে পরিশোধন করুন। চারায় রোগজীবানুর আক্রমণ কম হবে।

বেডে সার প্রয়োগ

নার্সারি বেডে উত্তম চারা উৎপাদন করতে হলে পরিমিত পরিমাণে বিভিন্ন রকমের সার প্রয়োগ আবশ্যক। সারের পরিমাণ মূলত মাটির উর্বরতা এবং উদ্ভিদের প্রজাতির উপর নির্ভরশীল। বেশি সার প্রয়োগ করলে চারা মোটা ও লম্বা হয়ে যায় এবং পরবর্তী বছর স্ট্যাম্প তৈরি করা যায় না। আবার খুব কম সার প্রয়োগ করলে চারার বৃদ্ধি কমে যায়। যাহোক, একটি স্থায়ী বীজতলার নার্সারি বেডে (১৩০০১.৩ মিটার) নিম্নলিখিত হারে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শুকনো গোবর	-	৮০ কেজি
কম্পোস্ট সার	-	৪০ কেজি
টি.এস.পি	-	৫০০ গ্রাম
এম.পি	-	৩০০ গ্রাম
ইউরিয়া	-	২০০ গ্রাম

বীজ বপনের ১০-১২ দিন আগে গোবর, কম্পোস্ট, টি. এস. পি ও এম. পি. সার ভালোভাবে মাটির সংগে মিশাতে হয়। চারা কিছুটা বড় হওয়ার পর ইউরিয়া পানির সাথে বা ছিটিয়ে কয়েকবার প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর বেডের মাটি হালকাভাবে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নির্ধারিত হারে বীজ ছিটানো পদ্ধতিতে বপন করুন।

পলিব্যাগ চারা উত্তোলনের জন্য বেড তৈরি

পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের জন্য বেডের মাটি চাষ করার প্রয়োজন নেই। কারণ এক্ষেত্রে বীজ পলিব্যাগের মধ্যে অবস্থিত মাটিতে বপন করতে হয়। তবে পলিব্যাগ যেখানে ঘন সারিবদ্ধভাবে রাখা হবে সেখানে পূর্বের ন্যায় এজিং করে নিতে হয়। ফলে পলিব্যাগগুলো সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তবে বীজতলার মাটি সমান ও আগাছামুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

নার্সারির জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ নির্ভর করে :

১. বছরে কতটি চারা উৎপাদন করা হবে।
২. কি কি ধরনের উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা হবে।
৩. নার্সারির উদ্দেশ্য ও এবং স্থায়ীত্ব।
৪. পুঁজি ও অর্থনৈতিক চাহিদা ইত্যাদির উপর।

কি পরিমাণ চারা উৎপাদনের জন্য কতটুকু জায়গার প্রয়োজন তা নিচে দেওয়া হলো :

পলিব্যাগের আকার	**প্রতি বর্গমিটারে উৎপাদিত চারার সংখ্যা**
১৫ সে.মি. ∞ ১০ সে.মি.	২২০ - ২২৫ টি
২৫ সে.মি. ∞ ১৫ সে.মি.	১০০ - ১০৫ টি
৪০ সে.মি. ∞ ২৩ সে.মি.	২৫ - ৩০ টি

সরাসরি বীজতলায় চারা উৎপাদন ও স্ট্যাম্প চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে চারার সংখ্যা :

চারা থেকে চারার দূরত্ব	**প্রতি বর্গমিটারে চারার সংখ্যা**
৪ সে.মি. ∞ ৪ সে.মি.	৬২৫ - ৬৫০ টি
৫ সে.মি. ∞ ৫ সে.মি.	৩৮০ - ৪০০ টি
১০ সে.মি. ∞ ৫ সে.মি.	১৯০ - ২০০ টি
১০ সে.মি. ∞ ১০ সে.মি.	৯৫ - ১০০ টি

নার্সারিতে রাস্তা ও ড্রেনের জন্য বীজতলার সমপরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হয়। অফিস, বিভিন্ন শেড ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জায়গার জন্য মোট জায়গার শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্ত জায়গা রাখতে হবে।

সারমর্ম

নার্সারিতে বেডে ও পলিব্যাগে উভয় পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা হয়। বেডে কম পরিশ্রমে, অল্প খরচে অধিক চারা উৎপাদন করা যায়। পক্ষান্তরে পলিব্যাগে শ্রম ও অর্থ বেশি লাগলেও চারা তুলনামূলকভাবে সুস্থ ও সবল হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন মাসে বীজতলার জন্য বেড তৈরি করা উত্তম?
(ক) জুন – জুলাই (খ) জানুয়ারি – ফেব্রুয়ারি
(গ) আগস্ট – সেপ্টেম্বর (ঘ) জুলাই – আগস্ট

২। নার্সারি বেডে ইউরিয়া সার কখন প্রয়োগ করতে হয় ?
(ক) বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর (খ) বীজ বপনের সময়
(গ) চারা গজানোর সংগে সংগে (ঘ) চারা কিছুটা বড় হওয়ার পর

৩। ২৫ ∞ ১৫ সে.মি. আকারের পলিব্যাগের দ্বারা প্রতি বর্গমিটারে উৎপাদিত চারার সংখ্যা কতটি ?
(ক) ১৫৫ - ১৬০ টি (খ) ৮৫ - ৯০ টি
(গ) ২২০ - ২২৫ (ঘ) ১০০ - ১০৫ টি

৪। ১০ সে.মি. ∞ ৫ সে.মি. আকারের সরাসরি চারা উৎপাদনের বীজতলায় প্রতি বর্গমিটারে উৎপাদিত চারার সংখ্যা কতটি ?
(ক) ১৯০ - ২০০ টি (খ) ৯৫ - ১০০ টি
(গ) ৩৮০ - ৪০০ টি (ঘ) ৬২৫ - ৬৫০ টি

৫। একটি স্থায়ী বীজতলার নার্সারি বেডে কি পরিমাণ শুকনো গোবর প্রয়োগ করতে হয়?
(ক) ১০০ কেজি (খ) ৯০ কেজি
(গ) ৮০ কেজি (ঘ) ৭০ কেজি

পাঠ-৫.৭ পলিব্যাগে চারা উৎপাদন

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- চারা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি সংগ্রহ, মাটি শোধন, পলিব্যাগে চারা ও বীজ বপনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বীজতলায় পলিব্যাগ স্থাপন ও পলিব্যাগে বীজ বপন কৌশল তুলে ধরতে পারবেন।

আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি নার্সারিতেই পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করতে দেখা যায়। পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের অনেকগুলো সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। তবে সবল ও সতেজ চারা পেতে হলে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন উত্তম।

নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের সুবিধাসমূহ :

১. চারা সবল ও সতেজ হয়।
২. বীজের অঙ্কুরোদগম হার বেশি এবং চারা বেঁচে থাকার হারও অনেক বেশি
৩. পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা রোপণ করা সহজ
৪. কম বীজ লাগে।
৫. চারার যত্ন নেয়া ও রোগবালাই দমন সহজতর হয়।
৬. পরিবহন বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চারা আনা-নেওয়া সহজ হয়।
৭. চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের অসুবিধাসমূহ :

১. চারা রোপণ ও উত্তোলনে খরচ বেশি হয়।
২. চারায় নিয়মিত পানি দিতে হয় অন্যথায় চারা মারা যেতে পারে।
৩. চারা অনেকদিন পলিব্যাগে রাখলে শিকড় জট বেঁধে চারা দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

পলিব্যাগের আকার ও মাপ

পলিব্যাগের আকার নির্ভর করে উদ্ভিদের প্রজাতি, কতদিন চারা পলিব্যাগে রাখতে হবে এবং স্থানীয় চাহিদার উপর। বাজারে বিভিন্ন আকারের পলিব্যাগ পাওয়া যায়। পলিব্যাগ কতটুকু মজবুত ও স্থায়ী হবে তা পলিথিনের পুরুত্ব ও গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। সাধারণত ০.০৪ মি.মি. থেকে ০.০৮ মি.মি. পুরুত্বের পলিথিলিনের সীট দ্বারা তৈরি পলিব্যাগই ব্যবহার করা হয়। পলিব্যাগ সংগ্রহের সাথে সাথে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ছিদ্র করা আবশ্যক, ছিদ্রগুলো ব্যাগের আকার অনুযায়ী ২ থেকে ৪ সারিতে থাকবে। ছিদ্রের সংখ্যাসহ নার্সারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন আকারের পলিব্যাগের মাপ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো :

পলিব্যাগের আকার	মাপ	ছিদ্রের সংখ্যা
ছোট	১৫ সে.মি.∞ ১০ সে.মি.	দুই সারিতে ৮ ছিদ্র
মধ্যম	২৫ সে.মি. ∞ ১৫ সে.মি.	তিন সারিতেই ১২ ছিদ্র
বড়	৪০ সে.মি. ∞ ২৩ সে.মি.	চার সারিতে ১৬ টি ছিদ্র

মাটি সংগ্রহ

পলিব্যাগের জন্য উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটি উত্তম। পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ রয়েছে এমন জমি থেকে মাটি সংগ্রহ করা ভালো। গভীর জমির উপরিভাগের ১৫ সে.মি. মাটি সংগ্রহ করতে হবে। বনাঞ্চলের উপরিস্তরের মাটিতে লতাপাতা পঁচে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ থাকে। সেজন্য বনাঞ্চলের মাটি উত্তম। তবে বনাঞ্চলের মাটি না পেলে বাড়ির আশেপাশের ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করে সেখানকার মাটি সংগ্রহ করা যেতে পারে। মাটি সংগ্রহ করার পর চালনি দ্বারা ইট, পাথর, আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। সম্ভব হলে সংগৃহীত মাটি বড় ড্রামে গরম করে শোধন করা যেতে পারে অথবা রাসায়নিকভাবে মাটি শোধন করা ভালো। সাধারণত একটি পলিব্যাগের অভ্যন্তরীণ আয়তনের ৭৫% মাটি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।

মাটি তৈরি

পলিব্যাগের জন্য প্রস্তুতকৃত মাটির সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ (মাটিঃ গোবর/কম্পোস্ট = ৩ঃ১) জৈব ও রাসায়নিক (অজৈব) সার মিশ্রিত হবে। অতঃপর পলিথিন ব্যাগে সার মিশ্রিত মাটি ভরে বীজ বা চারা রোপণের জন্য পলিব্যাগে করে পূর্বে প্রস্তুতকৃত বেডে সারি করে রাখতে হবে। জৈব সার হিসেবে গোবর, কম্পোস্ট ও ছাই ব্যবহার করা যেতে পারে। রাসায়নিক সার হিসেবে ইউরিয়া, টি.এস.পি ও এম.পি সার ব্যবহৃত হয়। জৈব সার ও ইউরিয়া বাদে সকল রাসায়নিক সার পলিব্যাগে মাটি ভর্তি করার অন্তত ২০ দিন পূর্বে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে স্তূপ করে রেখে দিতে হবে। ইউরিয়া সার চারা গজানোর পর কয়েক কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। নিচে ব্যাগের আকার অনুসারে সারের পরিমাণ দেওয়া হলো

পলিব্যাগের আকার	**প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার (কেজি)**		
	ইউরিয়া	**টি.এস.পি**	**এম.পি**
১৫ সে.মি. ∞ ১০ সে.মি.	০.৫০	১.২৫	০.৭৫
২৫ সে.মি. ∞ ১৫ সে.মি.	১.৩৫	৪.৫০	৩.১৫
৪০ সে.মি. ∞ ২৩ সে.মি.	৪.৯৫	১৬.৫০	১১.৫৫

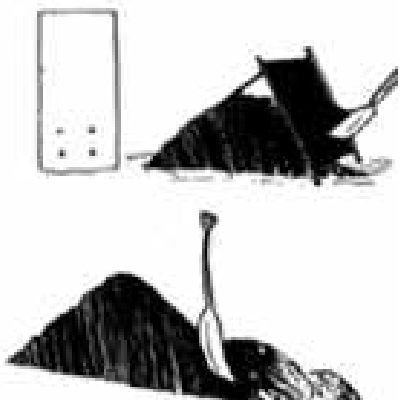

চিত্র - ৫৯ : পলিব্যাগের মাটি তৈরি এবং মাটি ও সারের মিশ্রণ তৈরি।

পলিব্যাগে মাটি ভর্তি করা

বীজ বপনের বা চারা রোপণের আগে সার মিশ্রিত মাটি ছিদ্রযুক্ত পলিব্যাগে ভর্তি করতে হবে। বাম হাতে পলিব্যাগ ধরে ডান হাতে মাটি পলিব্যাগে ভরতে হবে। মাঝে মাঝে হাত বা

বাঁশের কাঠি দ্বারা চাপ দিয়ে এবং দু'হাতে পলিব্যাগের উপরের অংশ ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে ভালোভাবে ব্যাগ ভর্তি করতে হবে। অন্যাথায় সেচ প্রদানের সময় মাটি নিচে নেমে যাবে। ফলে চারার গোড়ায় পানি জমে অসুবিধার সৃষ্টি করবে।

চিত্র-৬০ : পলিব্যাগে মাটি ভর্তিকরণ।

বীজতলায় পলিব্যাগ স্থাপন

পলিব্যাগ বেডে রাখার আগে বেডের মাটি ভালোভাবে দুরমুজ করে সমান করতে হবে। বীজতলায় যে কোন প্রান্ত থেকে একটির সাথে অন্যটির আঁটসাট করে সোজাভাবে পলিব্যাগ স্থাপন করতে হবে। পলিব্যাগ বসানো বাঁকা হলে চারাও বাঁকা ও দুর্বল হয়ে থাকে।

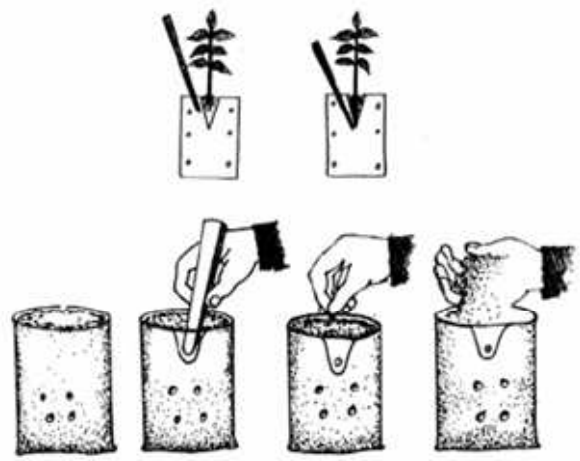

চিত্র - ৬১ : পলিব্যাগে চারা রোপণ ও বীজ বপন।

ব্যাগে বীজ রোপণ

পলিব্যাগ মাটি দিয়ে ভর্তি করে প্রতিটি ব্যাগের বীজ পরিশোধনের পর ১ বা ২ টি করে বীজ দু'আঙ্গুল দিয়ে টিপে রোপণ করতে হবে। যে সব বীজের অঙ্কুরোদগম হার বেশি সে সব বীজ সরাসরি পলিব্যাগে আঙ্গুল দিয়ে টিপে সহজেই বপন করা যায়। যেমন– আকাশমনি, কাঁঠাল, খয়ের, বাবলা, লেবু, বাতাবীলেবু, শিশু, মেহগনি, রেইনটি, কড়ই, চাপালিশ, জাম, জলপাই, পেঁপে, নাগেশ্বর, ইপিল-ইপিল, আমলকি ইত্যাদি। তবে যে সব উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম হার

তুলনামূলকভাবে কম সেক্ষেত্রে বীজতলায় চারা তৈরি করে চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে তুলে এনে পলিব্যাগে রোপণ করতে হয়। এছাড়া ট্রেতে চারা উৎপাদন করে সেখান থেকেও পলিব্যাগে স্থানান্তর (pricking) করা যায়। উভয় ক্ষেত্রে ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট চারাকে একদিকে সুচালো বাঁশের কাঠি দ্বারা সাবধানে তুলে স্থানান্তর করতে হয়। বীজ বপন বা চারা রোপণের পর থেকে চারা বিক্রয় বা স্থায়ীভাবে লাগানোর পূর্ব পর্যন্ত পলিব্যাগের চারার বিশেষ যত্ন নিতে হয়।

সারমর্ম

আমাদের দেশে অধিকাংশ নার্সারীতে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করতে দেখা যায়। পলিব্যাগে চারা উৎপাদনে খরচ ও শ্রম বেশি হলেও চারা অপেক্ষাকৃত সবল ও সতেজ হয়। পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করতে হলে পলিব্যাগের আকার ও মাপ থেকে শুরু করে পলিব্যাগে বীজ বপন পর্যন্ত যাবতীয় কৌশল ভালোভাবে জানা আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পলিব্যাগ চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক নয়?
(ক) চারা সবল ও সতেজ হয় (খ) বীজ কম লাগে
(গ) চারা উৎপাদনে খরচ কম হয় (ঘ) চারা পরিবহন সহজ হয়

২। পলিব্যাগে ব্যবহারের জন্য কোন ধরনের মাটি উত্তম?
(ক) উর্বর কাদা মাটি (খ) উর্বর এঁটেল মাটি
(গ) উর্বর বেলে মাটি (ঘ) উর্বর দো-আঁশ মাটি

৩। পলিব্যাগের জন্য সংগৃহীত মাটির শতকরা কত ভাগ জৈব সার থাকা উচিত?
(ক) ৫-১০ ভাগ (খ) ১৫-২০ ভাগ
(গ) ২০ - ২৫ ভাগ (ঘ) ৩০ - ৪০ ভাগ

৪। পলিব্যাগের অভ্যন্তরীণ আয়তনের শতকরা কত ভাগ মাটি দ্বারা পূর্ণ করতে হয়?
(ক) ৫০ ভাগ (খ) ৭৫ ভাগ
(গ) ৮৫ ভাগ (ঘ) ৯০ ভাগ

পাঠ- ৫.৮ ঃ চারার পরিচর্যা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- নার্সারির চারায় ছায়া প্রদান, সেচ-নিকাশ ও মালচিং প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সার প্রয়োগ, শিকড় ছাঁটাই ও গ্রেডিং এবং চারার রোগবালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- চারা হার্ডেনিং এবং এর উপায়সমূহ নির্দেশ করতে পারবেন।

নার্সারিতে চারা গাছের সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা করা প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে শিশু চারাগাছ ক্রমশ সুস্থ সবল রোপণের উপযুক্ত চারায় পরিণত হয়। সঠিকভাবে পরিচর্যা না পেলে কখনো সুস্থ, সবল নির্ধারিত সংখ্যক চারা পাওয়া যাবে না। নতুন স্থানে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত নার্সারিতে চারার যেসব পরিচর্যা করা হয় তা হলো-

১. শেড বা ছায়া প্রদান;
২. সেচ ও নিকাশ;
৩. মালচিং;
৪. আগাছা বাছাই ও মাটি আলগাকরণ;
৫. অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলা এবং শূন্যস্থান পূরণ;
৬. সার প্রয়োগ;
৭. শিকড় ছাঁটাই ও গ্রেডিং
৮. রোগবালাই ব্যবস্থাপনা;
৯. হার্ডেনিং বা শক্তকরণ;
১০. চারা সজ্জিতকরণ ও লেবেলিং।

শেড বা ছায়া প্রদান

অধিকাংশ উদ্ভিদের অঙ্কুরিত চারাকে অতিরিক্ত রোদ ও তাপ হতে রক্ষার জন্য খুঁটির সাহায্যে ০-১.৫ মিটার উচ্চতায় শেড বা ছায়া প্রদান করতে হয়। সাধারণত খড়, ছন, তরজা, বাঁশের ধারা ইত্যাদি দ্বারা চালা তৈরি করা হয়। চারা বড় হবার পর শেড সরিয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া চারা ছোট থাকাকালীন সময়ে ও ছায়া চাল সরিয়ে সকাল ও বিকালে চারাকে হাল্কা রোদের সংস্পর্শে আনতে হবে। শেড বীজতলায় মাটির রস সংরক্ষণে ও সাহায্য করে। তবে কিছু কিছু উদ্ভিদ, রয়েছে যেমন– সেগুন, গামার প্রভৃতি চারায় কোন শেড প্রদানের প্রয়োজন হয় না।

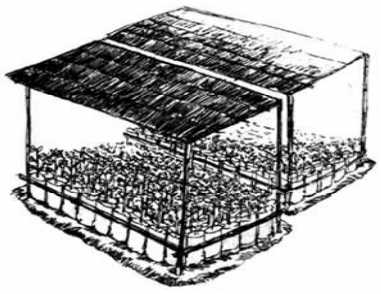

চিত্র ৬২ : ছায়া প্রদান

সেচ ও নিকাশ

খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও চারার জন্য বাতাস ও পানি অত্যাবশ্যক। সেজন্য বীজ বপন বা চারা রোপণের পর থেকেই পলিব্যাগ ও বেডে পানি দিতে হয়। সকালে অথবা বিকালে ঝরনা বা ঝাঁঝরির সাহায্যে অথবা স্প্রে মেশিন দিয়ে পরিমিত সেচ দেওয়া উচিত। সেচের ফলে অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয় এবং অঙ্কুরিত চারার মাটি হতে বিভিন্ন খনিজ উপাদান শোষণ সহজ হয়। তবে অতিরিক্ত সেচ প্রদানে বীজ বা চারা পচে যেতে পারে। সেজন্য বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি দ্রুত নিকাশের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

চিত্র -৬৩ : নার্সারি বেডে সেচ প্রদান

মালচিং

মাটির রস ও আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য খড়, পাতা, ছন, আবর্জনা ইত্যাদি দ্বারা বীজতলা ঢেকে দেওয়াকে মালচিং বলে। মালচিং মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে, বীজের অঙ্কুরোদগমকে ত্বরান্বিত করে ফেলে জমিতে কম সেচের দরকার হয়। নারিকেল, সুপারি, আমড়া, মেহগনি ইত্যাদি চারা উত্তোলনে মালচিং ব্যবহার করা হয়।

আগাছা পরিষ্কার ও মাটি আলগাকরণ

আগাছা চারা গাছের বড় শত্রু। এরা চারা গাছের সাথে খাদ্য, পানি, আলো ও জায়গা নিয়ে ভাগ বসায়। সুতরাং বীজ বপন বা চারা রোপণের পর থেকেই নার্সারির চারাকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ছোট অবস্থায় আগাছাকে হাত বা নিড়ানি দ্বারা তুলে বেডের বা পলিব্যাগের বাইরে ফেলতে হবে। অনেক সময় পলিব্যাগ ও বীজ চারার তলায় বার বার সেচ প্রদানের ফলে মাটির উপরিভাগ শক্ত হয়ে যায়। এতে চারার শিকড় আটকে বৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বাঁশের সুচালো কাঠি দ্বারা সাবধানে মাটি আলগা করে দিতে হবে। মাটি আলগা করার পর মাটি উত্তমরূপে শুকিয়ে সেচ দিতে হয়। ফলে চারার বৃদ্ধি ভালো হয় এবং আগাছার প্রকোপ হ্রাস পায়।

অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলা এবং শূন্যস্থান পূরণ

পলিব্যাগের চারা যখন টিকে যাবে কিংবা কিছুটা বড় হবে তখন কেবল একটি চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। তা না হলে চারার বৃদ্ধি কমে যাবে এবং চারা দুর্বল হবে। তাই সুস্থ সবল একটি চারা রেখে বাকিগুলো সাবধানে তুলে ফেলতে হবে। এছাড়া যে সব পলিব্যাগে চারা নেই সেগুলোতে অন্য পলিব্যাগের অতিরিক্ত চারা তুলে রোপণ করতে হবে।

বেডের ক্ষেত্রে চারা বেশি ঘন হলে একই রকম ঘটনা ঘটবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চারা রেখে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে।

সার প্রয়োগ

সুস্থ সবল চারার জন্য পলিব্যাগ ও নার্সারি বেডে সার প্রয়োগ করা হয়। তবে চারার বয়স ১.৫-২ মাস না হওয়া পর্যন্ড় কোন সার প্রয়োগ করা যাবে না। সাধারণত শুকনো গোবর, খইল ও ইউরিয়া সার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করে কিংবা মিহি গুঁড়া করে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। চারার বৃদ্ধি কেমন হচ্ছে তার উপর সারের পরিমাণ এবং কি প্রকারের সার প্রয়োজন তা নির্ভর করে। সার প্রয়োগের পর বীজতলায় ঝাঁঝরি বা স্প্রে মেশিন দিয়ে সেচ প্রদান করা ভালো। শীতের সকালে কুয়াশায় পাতা ভিজা থাকা অবস্থায় সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। এতে চারা গাছের কচি ডগা ও পাতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শিকড় ছাঁটাই ও গ্রেডিং

উদ্ভিদ শিকড় দ্বারা মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। পলিব্যাগে চারায় অনেক সময় চারার শিকড় পলিব্যাগে ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। এসব শিকড় চারার স্থানান্তরে অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। তাই সাবধানে ধারালো কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিতে হবে। শিকড় ছাঁটাই করার পর চারার বৃদ্ধি অনুযায়ী প্রায় একই উচ্চতার শিকড় চারাকে আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখতে হয়। একে গ্রেডিং বলে। গ্রেডিং এর ফলে পাশাপাশি থাকা একটি চারা অন্যটিকে আলো–বাতাস পেতে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি করে না।

চিত্র-৬৪ : শিকড় ছাঁটাই

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

নার্সারিতে চারাগাছে বিভিন্ন প্রকারের রোগ ও পোকার আক্রমণ হতে পারে। চারা উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি করে ড্যাম্পিং অফ নামক ছত্রাকবাহিত একটি রোগ। বীজ ও চারা উভয়ই এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগে বীজ আক্রান্ত হলে চারা গজায় না। আর গজানোর সাথে সাথে আক্রান্ত হলে অঙ্কুর নষ্ট হয়ে যায়। চারা আক্রান্ত হলে মাটির কাছাকাছি গোড়া ঢলে বা নেতিয়ে পড়ে। শিকড় আক্রান্ড় হলে চারার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। বীজতলা বা

পলিব্যাগের মাটি স্যাঁতস্যাঁতে থাকলে এবং মাটিতে বায়ু চলাচল কম হলে এ রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

১. বীজ বপনের পূর্বে মাটি ও বীজ শোধন করতে হবে।

২. পরিমিত পরিমাণে সেচ এবং প্রয়োজনীয় নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. চারায় রোগের আক্রমণ দেখামাত্র উপরের শেড সরায়ে ফেলতে হবে।

৪. বেশি ঘন করে বীজ বপন করা যাবে না

৫. কোন জৈব সার যেমন– গোবর মাটিতে প্রয়োগ করা যাবে না।

৬. আক্রান্ড় স্থানে ডায়থেন এম-৪৫ বা কুপ্রাভিট নামক ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

ইউক্যালিপটাস, পাইন ইত্যাদি উদ্ভিদের চারায় কম বেশি এ রোগ হয়। অন্যান্য ছত্রাক রোগের মধ্যে মূল পচা, আগা মরা, পাতার দাগ অন্যতম। এদের দমনে কুপ্রাভিট, ডায়থেন এম-৪৫, বর্দো মিক্সার, ফরমালিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা চারা আক্রান্ত হলে রোগের লক্ষণ দেখা মাত্র চারাকে তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। বীজতলায় বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়ে থাকে। ক্ষতিকারক পোকামাকড় কচি চারার ডগা ও পাতার রস চুষে কিংবা চিবিয়ে খেয়ে চারাকে নষ্ট করে ফেলে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ডায়াজিনন ৬০ ইসি, লিবাসিড ৫০ ইসি, ডাইএলড্রিন ২০ ইসি, সুমাথিয়ন ৫০ ইসি ইত্যাদি যে কোন কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

হার্ডেনিং

নার্সারিতে চারা যথেষ্ট যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে। ফলে চারাকে যখন নার্সারির নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ থেকে তুলে নতুন পরিবেশ রোপণ করা হয় তখন অনেক সময় চারা মারা যায়। সেজন্য নতুন পরিবেশে রোপণের মাস খানেক পূর্ব থেকেই বিভিন্ন উপায়ে চারাকে কিছুটা শক্ত ও কষ্ট সহিষ্ণু করা হয়। একেই হার্ডেনিং বলে। নার্সারিতে চারাকে হার্ডেনিং করার উপায়সমূহ হলো–

১. চারার বৃদ্ধির সাথে সাথে শেড সরিয়ে চারাকে রোদের সংস্পর্শে আনা এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে শেড সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলা।

২. সেচের পরিমাণ ক্রমশ কমানো।

৩. চারার উচ্চতা অনুযায়ী গ্রেডিং করা।

৪. পলিব্যাগের বাইরে আসা শিকড় ঘন ঘন ছাঁটাই করা।

৫. ইউরিয়া সার প্রয়োগ বন্ধ করা।

চারা সজ্জিতকরণ ও লেবেলিং

নার্সারিতে চারা বাছাই করে তা সুন্দরভাবে সাজিয়ে চিহ্নিতকরণ একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। মরা ও দুর্বল চারা কোন সময় নার্সারির প্রবেশ পথে রাখা উচিত নয়। কেননা এতে গ্রাহকগণ উৎসাহ হারাবেন। চারাগুলোতে ট্যাগ বা লেবেল লাগালে গ্রাহকগণ চারা ক্রয় করতে আস্থাবান হবেন। চারা সাজানোর সময় বা স্থানান্তর কালে পাতা বা কান্ড কোন সময় হাত

দিয়ে ধরতে নেই। পলিব্যাগ বা টবে হাত দিয়ে চারা উঠাতে হবে। চারা পরিবহনের সময় বাঁশের ঝুড়ি বা কাঠের বাক্স ব্যাবহার করা উচিত।

চারা পরিবহন

নার্সারি থেকে চারাকে রোপণ স্থানে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। চারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে কিংবা শিকড়ের মাটি আলগা হয়ে পড়ে গেলে রোপণের পর চারা বাঁচানো কষ্টকর। সাধারণত পলিব্যাগের চারা পরিবহন সুবিধাজনক। বীজতলা থেকে পরিমিত মাটিসহ চারা তুলে সাবধানতার সাথে রোপণ স্থানে নিয়ে গেলে রোপণের পর চারা মরার হার অনেক কমানো যায়।

চিত্র -৬৫ : চারা পরিবহন

সারমর্ম

নার্সারিতে সুস্থ ও সবল চারা পেতে হলে বীজ বপনের পর অঙ্কুরিত চারার যথাযথ যত্ন নেয়া আবশ্যক। এসব পরিচর্যাসমূহ হলো– চারায় ছায়া প্রদান, সেচ-নিকাশ, মালচিং, সার প্রয়োগ, শিকড় ছাঁটাই, গ্রেডিং, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং হার্ডেনিং।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। নার্সারির বেডে মালচিং এর ফলে কি উপকার হয়?
(ক) চারার বৃদ্ধি ভালো হয় (খ) মাটির উর্বরতা বেড়ে যায়
(গ) মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ হয় (ঘ) চারার শিকড়ের বৃদ্ধি ভালো হয়

২। নার্সারিতে চারা উৎপাদনের সবচেয়ে বড় সমস্যা ড্যাম্পিং অফ (Damping off) এর প্রধান কারণ কোনটি?
(ক) বীজতলা কিংবা পলিব্যাগের মাটির উর্বরতা কম হলে
(খ) বীজতলা কিংবা পলিব্যাগের মাটি স্যাঁতস্যাতে থাকলে
(গ) বীজতলা কিংবা পলিব্যাগের মাটির আর্দ্রতা কম হলে
(ঘ) বীজতলা কিংবা পলিব্যাগের মাটিতে জৈবপদার্থ কম থাকলে

৩। নার্সারিতে চারাকে হার্ডেনিং কেন করা হয়?

(ক) চারাকে কিছুটা শক্ত ও কষ্টসহিষ্ণু করার জন্য (খ) চারাকে বাছাই করার জন্য

(গ) চারার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য (ঘ) চারাকে সবল ও সতেজ করার জন্য

ব্যবহারিক

বিষয়-১ : সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে বনের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে বনের পরিমাণ এবং কোথায় কোন বনাঞ্চলে পাওয়া যায় তা আলোচনা করতে পারবেন।
- বনের বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও পশু–পাখি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষের তালিকা প্রণয়ন ও এদের প্রচলিত ব্যবহার লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

উপকরণ

ম্যাপ, মাঠ পর্যবেক্ষণ, নোট বুক, পেন্সিল, রাবার, কলম ইত্যাদি।

প্রথমে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া ম্যাপ এ বর্ণিত বনাঞ্চল সমন্ধে ধারণা নিন। আপনার নিকটস্থ এলাকায় যদি উল্লিখিত বন থেকে থাকেতো ভালো। অন্যথায় আপনাকে যে কোন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বন এলাকায় পরিদর্শনে যেতে হবে। পরিদর্শনের সময়বন বিভাগ কিংবা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের যে কোন কর্মী বা কর্মকর্তার সাহায়তা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে বন বিভাগের কর্মী অথবা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ব্লক সুপারভাইজার আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। উল্লিখিত উপকরণসমূহ সংগে নিয়ে যেতে হবে। অতঃপর নিচের বর্ণনানুযায়ী পরিদর্শনের সময় প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি লিখে রাখুন।

কাজের ধাপ

- প্রথমে বন এলাকাটি ঘুরে দেখুন।
- এলাকার অবস্থান, বনের ধরন আনুমানিক কতটুকু এলাকা নিয়ে বন বিস্তৃত, বনের কতটুকু জমি বৃক্ষ দ্বারা আবৃত তা লিখুন।
- বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদকে সনাক্ত করে তাদের নাম ও বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন। এক্ষেত্রে বৃক্ষ, গুল্ম, বীরুৎ ও আরোহী উদ্ভিদসমূহ আলাদাভাবে লিখতে হবে। এদের পরিমাণ ও অবস্থানভেদ উপস্থিতির ভিন্নতাও লিখুন।
- অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারসহ তালিকা তৈরি করুন।
- বনের মধ্যে যেসব পাখি ও অন্যান্য জীব-জন্তু দেখেছেন তাদের তালিকা তৈরি করুন।
- এছাড়া অন্য কোন অভিজ্ঞতা কিংবা উল্লেখযোগ্য যে কোন বিষয় মাঠ পর্যবেক্ষণ নোটবুকে লিখে রাখুন। বাড়ি ফিরে "সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে বনের পরিচিতি" এ শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে বন পরিদর্শন বিবরণ আপনার ব্যবহারিক খাতায় সুন্দরভাবে লিবিবদ্ধ করুন। এক্ষেত্রে আপনার যে কোন প্রশ্নোত্তর টিউটোরিয়েল ক্লাস থেকে জেনে নিন।

বিষয়- ২ : পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- বীজ বপনের জন্য ধারাবাহিকভাবে পলিব্যাগ তৈরি করতে পারবেন।
- বীজ বপন ও পরবর্তী যত্ন নেবার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. দো-আঁশ মাটি;
২. গোবর অথবা কম্পোস্ট সার;
৩. ১৫ ∞ ১০ সেমি আকারের পলিব্যাগ;
৪. পানি দেবার ঝাঁঝরি;
৫. বৃক্ষের বীজ;
৬. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি।

কর্যধারা

১. মাটিকে ভেঙ্গে ঝুরঝুরে করুন। আগাছা ও পাথরের টুকরা ভালোভাবে মাটি থেকে বেছে নিন। মাটি খুব ভিজা হলে প্রয়োজনমত রোদে শুকিয়ে নিন।
২. গোবর বা কম্পোস্ট সারকে অনুরূপ গুঁড়া করুন। শুকনা ও সমতল জায়গায় তিন ভাগ মাটির সাথে একভাগ পরিমাণ গোবর বা কম্পোস্ট সার ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
৩. পলিব্যাগ ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে নিন যাতে, ছিড়া কিংবা ফাটা না থাকে। অতঃপর তলাসহ দুই সারিতে সাবধানে ৮টি ছিদ্র করুন। লক্ষ্য রাখুন ছিদ্রগুলো দ্বারা যাতে শুধুমাত্র অতিরিক্ত পানি বেরুতে পারে।
৪. পলিব্যাগে গোবর বা কম্পোস্ট মিশ্রিত মাটি ভর্তি করুন। বারবার সাবধানে ঝাঁকুনি দিয়ে এমনভাবে মাটি ভর্তি করুন যেন মাটিপূর্ণ পলিব্যাগে কোন রকম ভাঁজ না পড়ে। প্রয়োজনে হাত দিয়ে চেপে মাটি ভর্তি করুন।
৫. সমতল ও কিছুটা ছায়াযুক্ত স্থানে বা পলিব্যাগের জন্য তৈরি বীজতলায় মাটি ভর্তি পলিব্যাগগুলো খাড়াভাবে সারিবদ্ধ করে সাজিয়ে রাখুন।
৬. মাটি ভর্তি প্রতিটি পলিব্যাগে আঙ্গুল দ্বারা ছোট গর্ত করুন। বীজের আকার এবং উদ্ভিদ প্রজাতি অনুযায়ী গর্তের গভীরতা কম বেশি হতে পারে।
৭. প্রতিটি গর্তে একটি করে বীজ বসিয়ে দিন।
৮. হাত দ্বারা গর্তগুলো ভরাট করে আলতোভাবে মাটি চেপে দিন।
৯. ঝাঁঝরি দ্বারা পরিমিত পানি প্রতিটি পলিব্যাগে ছিটিয়ে দিন।
১০. প্রতিদিন সকাল ও বিকেল বেলায় ঝাঁঝরি দিয়ে পলিব্যাগে পরিমিত পানি দিন এবং বীজের অঙ্কুরোদগম পর্যবেক্ষণ করুন।
১১. অঙ্কুরোদগমের পর চারার যত্ন নিন এবং প্রয়োজনে আগাছা পরিষ্কার করুন।
১২. চারার উচ্চতা ১০-১৫ সে.মি. হবার পর অপেক্ষাকৃত দুর্বল চারাটি সাবধানে তুলে চারাবিহীন (যেটিতে একটি চারাও গজায়নি) পলিব্যাগে স্থানান্তরিত করুন।
১৩. পলিব্যাগ থেকে ভূমিতে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত চারার প্রয়োজনীয় যত্ন নিন।
১৪. যাবতীয় কার্যক্রম আপনার খাতায় লিখুন এবং আপনার টিউটরকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিন।

চিত্র - ৬৬ : পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন কৌশল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। বন কাকে বলে? উদাহরণসহ প্রকৃতিক ও কৃত্রিম বনাঞ্চল বর্ণনা করুন।

২। বনের গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে লিখুন।

৩। মানচিত্রে বাংলাদেশের বনাঞ্চলগুলো উল্লেখ করুন।

৪। বনাঞ্চল কত প্রকার বর্ণনা করুন।

৫। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কি? বর্ণনা করুন।

৬। বন আইন ও বন্যা প্রাণী আইন কি? বন আইন ও বন্য প্রাণী বিধি বর্ণনা করুন।

৭। বন নার্সারি বলতে কি বুঝায়? বন নার্সারির উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন। একটি আধুনিক নার্সারিতে সাধারণত কি কি ব্যবস্থাসমূহ থাকে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

৮। নার্সারি ব্যবস্থাপনায় প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি? একটি আদর্শ নার্সারির নক্সা অংকন করুন।

৯। বিভিন্ন ধরনের কলমের চারা উৎপাদনের কৌশল উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।কলমের চারা উৎপাদনের সুবিধাসমূহ লিখুন।

১০। পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের কৌশল ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করুন।পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

১১। টীকা লিখুন :

(ক) মালচিং (খ) হার্ডেনিং (গ) টিসু কালচার (ঘ) গুটি কলম।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১	:	১। ক	২। গ	৩। খ	৪। ঘ	৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৫.২	:	১। ঘ	২। ক	৩। গ	৪। গ	৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩	:	১। খ	২। ঘ	৩। গ	৪। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৫.৪	:	১। গ	২। খ	৩। গ	৪। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৫.৫	:	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৫.৬	:	১। খ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। ক	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৫.৭	:	১। গ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৫.৮	:	১। গ	২। খ	৩। ক		